আমি সমাজতান্ত্রী

স্বামী বিবেকানন্দ

অদ্বৈত আশ্রম থেকে প্রকাশিত স্বামী বিবেকানন্দের বিভিন্ন সময়ের বক্তৃতা ও রচনা থেকে সংকলিত Caste culture and Socialism পুস্তকের I am a Socialist শীর্ষক রচনার অনুবাদ করেছেন মৃণাল ভদ্র।

চার বর্ণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র একের পর এক পৃথিবী শাসন করবে। প্রতিটি বর্ণের পূর্ণ আধিপত্যের এমন কিছু কাজ হয়ে থাকে যা জনসাধারণের মঙ্গল করে, আবার ওদের অনিষ্ট করে এমন কাজও হয়ে থাকে।
পুরোহিত সমস্ত জ্ঞান ও বিদ্যা যেমন নিজের কাছে সঞ্চিত রাখতে চায়, রাজাও সেই রকম পার্থিব শক্তিকে সঞ্চয় করতে ব্যস্ত থাকে এবং সবই একটি কেন্দ্রে অর্থাৎ নিজের কাছে সংগঠিত রাখতে চায়। অবশ্য, দুইই সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর। এক সময়ে সমাজেরসাধারণ কল্যাণের জন্য দুয়েরই দরকার ছিল, কিন্তু সে হোল সমাজের শৈশবকাল।
রাজা, প্রজাপুঞ্জের শক্তি কেন্দ্র হয়ে শীঘ্র ভুলে যায় যে ঐসব শক্তি তার কাছে ন্যস্ত রয়েছে যাতে সে শক্তি বৃদ্ধি করতে পারে এবং সহস্র গুণ সম্ভাবনায় সে শক্তিতে প্রত্যর্পণ করতে পারে, যাতে সমস্ত সমাজের কল্যাণের জন্য তা ছড়িয়ে পড়তে পারে। যেমন রাজার মত নিজের উপর সমস্ত দেবত্ব আরোপ করে অহঙ্কারে আর সকল মানুষকে যে ঘৃণ্য মনে করে; এবং চায়, তারা তার কাছে মাথা নুইয়ে থাকবে, তার ইচ্ছার বিদ্ধে বাধা, ভাল মন্দ হোক, প্রজাদের মস্ত বড় অপরাধ। ফলে প্রজাপালনের স্থলে অত্যাচার দেখা দেয় -- প্রজারক্ষার নামে প্রজার রক্ত শোষিত হয়। সমাজ যেখানে সুস্থ ও সবল শীঘ্রই সেখানে রাজা ও প্রজার মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ দেখা দেয় এবং সেই আন্দোলনের ফলে রাজদণ্ড ও মুকুট দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। রাজসিংহাসন এবং রাজকীয় সমস্ত ভূষণ অতীত কৌতূহলের বস্তু হয়ে সংগ্রহশালায় রক্ষিত হয়।
এই সংঘর্ষের ফলে, বৈশ্যের সুবৃহৎ শক্তির উদ্ভব ঘটে যার রোষদৃষ্টির সামনে মুকুট পরিহিত মস্তকে বীরশ্রেষ্ঠগণ তাদের সিংহাসনে পাতার মত কাঁপতে থাকে। ধনী দরিদ্র সকলেই বৈশ্যকে দীনভাবে অনুসরণ করে, সকলের আশা তার হাতের স্বর্ণঘট যা ট্যান্টালাসের মত সব সময়ই হস্তচ্যুত হয়ে যাচ্ছে। বৈশ্যের শক্তি মুদ্রা সঞ্চয়ে, যার মধুর নিক্কণ চার বর্ণের সকলের মনে দুরপনেয় মোহ বিস্তার করে। বৈশ্য সব সময়ে ভীত থাকে পাছে ব্রাহ্মণ তার সঞ্চয় থেকে তাকে বঞ্চিত করে কিংবা ক্ষত্রিয় বাহুবলের অধিক শক্তিতে তাকে গ্রাস করে। তাই, আত্মরক্ষায় সকল বৈশ্য গোষ্ঠীবদ্ধভাবে একাত্ম। বণিকের সব সময় সতর্ক দৃষ্টি যাতে রাজশক্তি তার ধনাগমে বাধা সৃষ্টি না করে। কিন্তু, এ সব সত্বেও, তার এতটুকু ইচ্ছা নেই যে রাজার কাছ থেকে ক্ষমতা শূদ্রের হাতে আসে। এমন কোন দেশ নাই যেখানে বণিকের প্রবেশ নেই। সে নিজে জ্ঞানী নয়, কিন্তু পণ্য বহন করে সে এক দেশের জ্ঞান, শিল্প বিজ্ঞান ও সাধন অন্য দেশে প্রতিষ্ঠিত করে।
আর কোথায়ই বা তারা যাদের দৈহিক শ্রমের ফলেই ব্রাহ্মণের প্রতিপত্তি, ক্ষত্রিয়ের শক্তি এবং বৈশ্যের সম্পত্তি সম্ভব হয়েছে?কী তাদের ইতিহাস, যারা সমাজের প্রকৃত শরীর, অথচ সব দেশে সব কালে যারা 'নীচ - অন্ত্যজ' বলে অভিহিত? ...ভারতবর্ষের বাইরে অন্য দেশে, মনে হয়, শূদ্রদের পরস্পরের প্রতি ঘৃণা রয়েছে। যদি অন্য সব শ্রেণী থেকে তারা সংখ্যায় খুব বেশী হয়, তাহলে কি হবে? যে ঐক্যের ফলে দশ জন দশ লক্ষের শক্তি সংগ্রহ করতে পারবে, শূদ্র শ্রেণী এখনও তা আয়ত্ত করতে পারে নি। তাই, প্রকৃতির নিয়মে, শূদ্ররাই সর্বদা শোষিত শ্রেণী।

তবু, একদিন আস্‌বে, যেদিন শূদ্র শ্রেণীর অভ্যুত্থান ঘট্‌বে, শূদ্রত্ব নিয়েই তারা জাগ্‌বে; অর্থাৎ আজকের দিনের মত নয়। যখন তারা ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের গুণ অর্জন করে, বড় হবার চেষ্টা করছে। কিন্তু একদিন আসবে, যেদিন সকল দেশের শূদ্র তাদের সহজাত প্রবৃত্তিও অভ্যাস নিয়ে, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য হবার চেষ্টা না করে, শূদ্র হিসাবেই সমস্ত সমাজে সার্বভৌম প্রভুত্ব অর্জন করবে। এই নবশক্তির প্রথম ঊষার আলো পশ্চিম জগতে ধীরে ধীরে ফুটতে আরম্ভ করেছে; এবং চিন্তাবিদ্‌গণ এই নতুন আবির্ভাবের শেষ ফল কি হবে, তা ভেবে কুল পাচ্ছেন না সমাজতন্ত্র, নৈরাজ্যবাদ, শূন্যবাদ এমনি আরও অনেক কিছুই যে সমাজবিপ্লব আসছে তার সম্মুখবাহিনী। আবহমান কাল থেকে শোষণ ও অত্যাচারের পেষণে শূদ্ররা স্বভাবতঃ হীন, দাসত্ববৃত্তিপরায়ণ, উচ্চশ্রেণীর পদলেহী কুকুরের মত অথবা হিংস্র পশুর মত বন্য।

পশ্চিম দেশে শিক্ষার সম্প্রসারণ সত্বেও শূদ্রশ্রেণীর উন্নতির পথে একটি প্রবল বাধা রয়েছে; তা হোল উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ভাল অথবা খারাপ গুণের দ্বারা স্থিরীকৃত শ্রেণীনির্ণয়। প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে এই গুণগত শ্রেণী - নির্ণয় প্রচলিত ছিল, যার ফলে শূদ্রশ্রেণীকে শৃঙ্খলিত করে রাখা হয়েছিল। প্রথমতঃ শূদ্র হলে ধন সঞ্চয়ে কোন সুযোগ থাক্‌ত না, জ্ঞানার্জনের সুযোগ থেকেও সে বঞ্চিত হোত; এই অসুবিধার সঙ্গে যুক্ত ছিল বিশেষ একটি প্রথা, যার পলে শূদ্রশ্রেণীতে অসাধারণ গুণ ও প্রতিভাসমন্বিত কেউ জন্মগ্রহণ করলে, প্রতিপত্তিশালী উচ্চ বর্ণের ব্যক্তিরা তাকে সম্মানজনক উপাধি প্রদান করে নিজেদের শ্রেণীতে উন্নীত করত। তার ধনসম্পদ এবং জ্ঞানশক্তি অপর শ্রেণীর মঙ্গলের জন্য কাজে লাগান হোত, এবং তার নিজের শ্রেণীর লোকেরা তার অর্জিত গুণাবলী থেকে বিশেষ কোন সুফলই লাভ করত না! শুধু তাই নয়, এই সব অবাঞ্ছিত লোকগুলি, যাদের মনে করা হোত উচ্চ শ্রেণীর পায়ের ধূলি বা আবর্জনা, দূরে নিক্ষিপ্ত হয়ে শূদ্র শ্রেণীকে সংখ্যায় বৃদ্ধি করত।

বশিষ্ঠ, নারদ, সত্যকাম জবালা, ব্যাস, কৃপ, দ্রোণ, কর্ণ এবং এই রকম আরও অনেকে, যাদের পিতৃপরিচয়ের সন্দেহ ছিল, জ্ঞান ও শক্তির উৎকর্ষে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পদে উন্নীত হয়েছিলেন। কিন্তু এই ধরনের উন্নতীকরণের ফলে গণিকা, দাসী, ধীবর অথবা সারথি শ্রেণী কতখানি উঁচুতে উঠেছিল, সেটা সন্দেহের বিষয়। আবার, অন্যদিকে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য শ্রেণী থেকে যারা পতিত হোত, তার শূদ্রশ্রেণীর সংখ্যাকে বাড়িয়ে তুলত।

বর্তমান ভারতবর্ষে, শূদ্রবংশে জাত বিরাট ধনী বিখ্যাত পণ্ডিতের নিজের সমাজ ত্যাগ করবার অধিকার নেই। ফলে, তার ধন,বুদ্ধি ও জ্ঞানের শক্তি নিয়ে নিজের শ্রেণীতে আবদ্ধ থাকতে হয় এবং নিজের শ্রেণীর উন্নতির জন্য সে সেগুলিকে কাজে লাগাতে পারে।বংশগত এই বর্ণ - ভেদ নিজের গণ্ডী অতিক্রম করতে না পেরে, ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে একই শ্রেণীর অন্তর্গত মানুষদের উন্নতি বিধান করছে। ভারতবর্ষের নীচু বর্ণের এই ভাবে উন্নতি হতে থাক্‌বে, যতদিন এই দেশ জাতিও পদ নির্বিশেষ শাসনতন্ত্রের অধীন থাক্‌বে।

মানব সমাজ ক্রমান্বয়ে চার বর্ণ দ্বারা শাসিত হচ্ছে -- পুরোহিত, সৈন্য, ব্যবসায়ী এবং শ্রমিক।। সবশেষে আসবে শ্রমিক (শূদ্র) শাসক। এর সুবিধার দিক হবে, জৈবিক সুখ - সুবিধার বিতরণ এবং অসুবিধা ঘটবে, (হয়ত) সংস্কৃতির অবনতি নিয়ে সাধারণ সংস্কৃতিরর প্রভূত বিস্তৃতি হবে, কিন্তু অসাধারণ প্রতিভাশালীদের সংখ্যা কমে আসবে।

যদি এমন কোন রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব হয়, যেখানে পুরোহিতের জ্ঞান, সৈনিকের সংস্কৃতি, বণিকের বিতরণ প্রবৃত্তি এবং শ্রমিকের সাম্যের আদর্শ তাদের দোষগুলিকে বাদ দিয়ে বজায় থাকতে পারে, তাহলে তাই হবে আদর্শ রাষ্ট্র। কিন্তু তা কি সম্ভব?

তবু প্রথম তিন শ্রেণী তাদের যুগকে পেরিয়ে এসেছে। এখন শেষ শ্রেণীর যুগ --- তাদের তা মেনে নিতেই হবে --- কেউ রোধ করতে পারবে না। আমি স্বর্ণ বা রৌপ্য মানের অসুবিধার কথা জানি না (কেউই জানে বলে মনে হয় না); কিন্তু আমি দেখছি, স্বর্ণমান গরীবকে আরও গরীব করেছে এবং ধনীকে আরও ধনী করে তুলেছে। ব্রিয়ান ঠিকই বলেছিলেন, "আমরা স্বর্ণক্রুশে বিদ্ধ হতে চাই না"। রৌপ্যমানে গরীবরা অসমযুদ্ধে একটু বেশী সুযোগ পাবে। আমি সমাজতন্ত্রী, তার কারণ এ নয় যে আমি এই ব্যবস্থাকে নির্দোষ মনে করি, কিন্তু আধখানা টি, টি না থাকার থেকে ভাল। (নেই - মামার চেয়ে কানা - মামা ভাল)।

অন্য সমাজব্যবস্থার পরীক্ষা হয়ে গেছে এবং সেগুলি অনুপযুক্ত মনে হয়েছে। এই ব্যবস্থার পরীক্ষা হোক -- কিছু না হলেও,

অন্ততঃ অভিনবত্বের জন্যই হোক। সুখ - দুঃখের পুনর্বিন্যাস অনেক ভাল, অন্ততঃ একদল লোকই চিরকাল সুখ ভোগ করবে, তা থেকে ভাল প্রত্যেক লোককে এই দুঃখের পৃথিবীতে তার অংশ দেওয়া হোক।

সমাজের সকল লোকেরই অর্থ, বিদ্যা অথবা জ্ঞান অর্জনে সমান সুযোগ থাকা উচিত। সর্বক্ষেত্রে স্বাধীনতা অর্থাৎ মুক্তির দিকে অগ্রসর হওয়াই মানুষের সবচেয়ে বড় লাভ। যে সব সামাজিক নিয়ম এই স্বাধীনতার পথে বিঘ্ন, সেগুলির ক্ষতিকর এবং দ্রুত সেগুলিকে নষ্ট করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। মুক্তির পথে যে সব প্রতিষ্ঠান মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যায়, সেগুলি গড়ে তোলা উচিত।

মনে রাখতে হবে, কুটীরেই সমস্ত জাতি বাস করে। কৃষক, মুচি, মেথর এবং ভারতের অন্য সব নীচু শ্রেণীদের তোমাদের থেকেঅনেক বেশী কর্ম - ক্ষমতা ও আত্মনির্ভরতা আছে। বহু যুগ ধরে তারা নীরবে কাজ করে আসছে এবং একটিও না লিশ না জানিয়ে তারা দেশের সমস্ত সম্পদ উৎপাদন করেছে। শীঘ্রই তারা তোমাদের চেয়ে উঁচুতে স্থান করে নেবে। আস্তে আস্তে তাদের হাতে মূলধন চলে যাচ্ছে এবং তারা তোমাদের মত অভাব নিয়ে অতটা উদ্বিগ্ন নয়। আধুনিক শিক্ষা তোম াদের দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টেছে, কিন্তু অনুসন্ধিৎসু প্রতিভার অভাবে সম্পদ সংগ্রহের নূতন পথ অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে। এতকাল তোমরা এই সব সহিষ্ণু জনসাধারণকে নিপীড়ন করেছে; এইবার সময় এসেছে তাদের হাতে ফলভোগ করবার। জীবিক াকে জীবনের সার করে বৃথা অন্বেষণে তোমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করলে তোমাদের খাদ্য ও পরিধেয় বন্ধ হয়ে যাবে। আর তোমরাই তাদের ছোটলোক বলে মনে কর এবং নিজেদের সংস্কৃতির দম্ভ কর! জীবন - সংগ্রামের আবর্তে পড়ে তারা জ্ঞানলাভের সুযোগ পায়নি। এতকাল তারা যন্ত্র যেমন মানুষের বুদ্ধিচালিত হয়ে কাজ করে, সেইরকম এক ভাবে কাজ করে এসেছে এবং চতুর শিক্ষিত সম্প্রদায় তাদের পরিশ্রমের ফলের বেশীর ভাগ গ্রাস করেছে। সবদেশেই এই ঘটেছে।

কিন্তু যুগের পরিবর্তন ঘটেছে। নীচু শ্রেণীরা আজ একথা বুঝতে শিখেছে এবং এই অত্যাচারের বিদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে তাদের ন্যায্য পাওনা আদায় করতে বদ্ধপরিকর। ...উঁচু শ্রেণী কিছুতেই শত চেষ্টা সত্ত্বেও নীচু শ্রেণীদের আর দমন করতে পারবে না উন্নত স্তরের লোকেদের কল্যাণ একমাত্র অনুন্নত শ্রেণীকে তার ন্যায্য পাওনা আদায় করতে সাহায্যের মধ্যেই রয়েছে।

জনসাধারণ যখন জাগবে, তারা তোমাদের অত্যাচারকে বুঝতে পারবে এবং তাদের এক ফুৎকারে তোমরা উড়ে যাবে! ত ারাই তোমাদের মধ্যে সভ্যতা এনেছে এবং তারাই তা নামিয়ে ফেলবে। মনে কর, গল্‌দের হাতে কি করে প্রাচীন শক্তিশালী রোমান সাম্প্রজ্য ধূলায় মিশে গিয়েছিল।তাই আমি বলছি, এই সব নীচু শ্রেণীকে বিদ্যা ও সংস্কৃতির প্রচার করে জাগাও। যখন তারা জাগবে, এবং একদিন তারা নিশ্চয়ই জাগবে। তোমাদের উপকারের কথা মনে করে তোমাদের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকবে।

আমরা গরীব ও নিম্নশ্রেণীদের কিভাবে দেখি, ভেবে আমার অন্তর ব্যথায় ভরে ওঠে। তাদের কোন সুযোগ নেই, মুক্তি নেই, ওপরে উঠবার রাস্তা নেই। ...প্রতিদিন তারা নীচু থেকে নীচুতে তলিয়ে যাচ্ছে। নিষ্ঠুর সমাজের আঘাতকে তারা অনুভব করে এবং কোথাথেকে সে আঘাত আসছে, তা তারা জানে না। তারা যে মানুষ, একথা তারা ভুলে গেছে। ফলে তারা দ াসে পরিণত হয়েছে। বিগত কয়েক বৎসরে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এটা বুঝেছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় সমস্ত দোষ তাঁরা হিন্দুধর্মের ঘাড়ে চাপিয়েছেন; এবং তাদের কাছেউন্নতির একমাত্র পথ হোল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ধর্মকে ধবংস করা। হে বন্ধু, শোন, আমি ঈশ্বরের আশীর্বাদে গোপন সত্যকে আবিষ্কার করেছি। ধর্মের দোষ নেই। একদিকে তোমার ধর্ম শেখাচ্ছে, সকল মানুষ তোমার আত্মার বহু রূপ। কিন্তু, অভাব ঘটেছিল এই বিশ্বাসেরবাস্তব প্রয়োগ -- সহানুভূতি ও হৃদয়ের অভাব ছিল। এই অবস্থাকে ধর্ম ধবংস করে দূর করা যাবে না, বরং হিন্দু ধর্মের মহৎ শিক্ষাকে অনুকরণ করে এবং তার সঙ্গে হিন্দুধর্মের যুক্তিগত অগ্রগতি বৌদ্ধধর্মের আশ্চর্য সহৃদয়তাকে যুক্ত করে একে দূর করতে হবে। ...হাজার হাজার নরনারী পবিত্রতার প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে ঈশ্বরে অবিচল বিশ্বাসে দৃঢ় হয়ে এবং সিংহের সাহসের সঙ্গে দরিদ্র, পতিত, নিপীড়িতের জন্য সহানুভূতি যুক্ত হয়ে সমগ্র দেশের সকল স্থানে মুক্তির বাণী, সাহায্যের বাণী, সামাজিক উন্নয়নের বাণী -- সাম্যের বাণী প্রচ ার করে বেড়ায়।

তোমাদের এখন কাজ হচ্ছে গ্রামে ঘোরা এবং সব মানুষকে বোঝান, অলস হয়ে বসে থাকলে আর চলবে না। তাদের

প্রকৃত অবস্থা বোঝাও এবং বল, "তোমরা আমাদের ভাই, ওঠ, জাগ, আর কতকাল তোমরা ঘুমিয়ে থাকবে।" ...এতকাল ব্রাহ্মণেরা ধর্মের একাধিপত্য করেছে; কিন্তু তারা কালের গতির সামনে টিকতে পারছে না। তাই যাও, এবং এমন কিছু কর, যাতে সকলে ধর্মকে পেতে পারে। তাদের মনে এক ধারণার সৃষ্টি কর, ব্রাহ্মণদের মত তাদেরও ধর্মের সমান অধিকার আছে। সকলকে, এমনকি চণ্ডাল পর্য্যন্ত, এই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত কর। এছাড়া সহজ কথায় জীবনের প্রয়োজনীয় বিষয়ে, ব্যবসা - বাণিজ্য, কৃষিকার্য ইত্যাদিতে তাদের শিক্ষা দাও। যদি তোমরা এ কাজ করতে না পার তাহলে তোমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে ধিক্, তোমাদের বেদ - বেদান্ত চর্চায় ধিক!

যতই আর্যবংশসম্ভূত বলে গর্ব করে বেড়াও না কেন, দিন রাত্রি প্রাচীন ভারতের গৌরবসঙ্গীত গাও, আর নিজের জন্মকৌলিন্যেযতই গর্বিত হয়ে চলনা কেন, ভারতবর্ষের উচ্চবর্ণীয়গণ, তোমরা কি নিজেদের জীবিত মনে কর? তোমরা দশ হাজার বছরের পুরানোমমি ছাড়া কিছু নও! তোমাদের পূর্বপুষেরা যাদের মৃতদেহের মত ঘৃণা করতেন, তাদের মধ্যেই ভারতবর্ষের যা কিছু অবশিষ্ট প্রাণশক্তি তাই আছে; আর তোমরাই হচ্ছ সত্যকার জীবিত মৃতদেহ। তোমদের ঘর - বাড়ি, আসবাবপত্র সংগ্রহশালায় রক্ষিত বস্তুর মত মনে হয়, সেগুলি এত প্রাণহীন ও পুরাতন মনে হয়। তোমাদের আচার - অনুষ্ঠান, চলা - ফেরা, জীবনযাপনের নিয়ম দেখে কারও মনে হবে, যেন ঠাকুরমার গল্প শুনছে। তোমাদের সঙ্গে পরিচয়ের পর যখন কেউ ফিরে আসবে, তার মনে হবে, সে বোধ হয় আঁকা ছবির প্রদর্শনীতে গিয়েছিল। এই মায়ার জগতে, তোমরাই সত্যকার ভ্রান্তি, রহস্য, মভূমিতে সত্যকার মরীচিকা। তোমরা অতীতকালকে চিহ্নিত করছ, অতীতকালের সমস্ত আকারগুলি তোমাদের মধ্যে জট পাকিয়ে গেছে। এখনও যে তোমাদের দেখতে পাওয়া যায়, তা আজীর্ণের ফলে দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়। তোমরা শূন্য, এবং ভবিষ্যতের বস্তুহীন শূন্যতা। স্বপ্নলোকের অধিবাসী তোমরা, কেন আর এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছ? অতীত ভারতবর্ষের রক্তমাংস হীন কঙ্কাল তোমরা --- কেন তোমরা তাড়াতাড়ি ধূলায় পরিণত হয়ে বাতাসে মিশে যাচ্ছ না? তোমাদের হাড়ের আঙ্গুলে পূর্বপুষদের সঞ্চিত অমূল্য রত্নের অঙ্গুরী রয়েছে এবং তোমাদের মৃতদেহের পুতিগন্ধ আলিঙ্গনে বহু পুরাতন রত্নের সিন্দুক রয়েছে। এককালে তোমরা সেগুলিকে অন্যদের হাতে দিতে পার নি। এখন বৃটিশ শাসনে অবাধ শিক্ষা ও জাগরণের যুগে, ওগুলি তোমাদের উত্তরাধিকারীদের দিয়ে দাও, হ্যাঁ, যত তাড়াতাড়ি পার দিয়ে দাও। তোমরা শূন্যে মিলিয়ে যাও, আর তোমাদের জায়গায় নূতন ভারতবর্ষ উঠে আসুক। আসুক সে --- লাঙ্গল হাতে নিয়ে চাষার কুটির ভেদ করে, জেলেমালো মুচি মেথরের কুঁড়ের মধ্য হতে। বের হোক মুদীর দোকান থেকে, ফলওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরিয়ে আসুক সে কারখানা থেকে, দোকান থেকে, বাজার থেকে। বের হোক বনজঙ্গল থেকে, পাহাড় পর্বত থেকে। এই সব সাধারণ মানুষেরা হাজার হাজার বছর ধরে নির্যাতন সয়েছে--- একটিও কথা না বলে সহ্য করছে। তারা লাভ করছে আশর্চ্য সহনশীলতা। অন্তকাল দুঃখ সহ্য করে তারা পেয়েছে অবিচলিত প্রাণশক্তি। একমুটো ছাতু খেয়ে তারা ঝিকে কাঁপিয়ে দিতে পারে, আধখানা টি পেলে সারা জগতে তাদের শক্তি ধরবে না। এদের মধ্যে রয়েছে রক্তবীজের মত অপর্যাপ্ত প্রাণশক্তি। তা ছাড়া, শুদ্ধ নৈতিক জীবনে থাকে যে অদ্ভুত শক্তি তা এদের আছে, পৃথিবীর আর কোথাও তা দেখা যাবে না। এমন প্রশান্তি, এমন আত্মতৃপ্তি, এমন ভালবাসা, এমন নীরবে অবিরাম কাজ করবার শক্তি, এবং কাজের সময় এমন সিংহের মত বিক্রম -- তুমি আর কোথায় পাবে? অতীতের কঙ্কালরা, তোমাদের সামনে তোমাদের উত্তরাধিকারী, আগামী দিনের ভারতবর্ষ। তেমাদের বত্ন - সিন্দুক ফেলে দাও, রত্ন অঙ্গুরী দূরে নিক্ষেপ কর যত তাড়াতাড়ি পার, সব ফেলে দেও--- বাতাসে মিলিয়ে যাও, আর দেখা দিও না -- শুধু কান পেতে শোন। তোমরা অদৃশ্য হবার সঙ্গে সঙ্গে নব জাগ্রত ভারতের প্রথম জয়ধবনি সহস্র বজ্রনির্ঘোষে সমগ্র বিশ্ব মন্দ্রিত হবে--- "ওয়া গুজীকে ফতে--- গুজীর জয়।"

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com